International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.40-47
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.40-47

সিঙ্গুর আন্দোলন ও অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্প

প্রহ্লাদ রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
India is primarily an agricultural country. Agriculture is the backbone of India's economy. So whenever agricultural land acquisitions happened in different parts of India at various times, the common people have roared in protest. This is how various mass movements against agricultural land acquisition was organized in Indian history. One such movement that took place in West Bengal at the very beginning of the 21st century was the Singur movement. This Singur movement is in the context of a short story entitled 'Bahiragata' (The Outsider) by Anita Agnihotri, a prominent writer of Bengali literature. This article aims to assess how the author has shown and explained the agricultural land acquisition for the Tata company's car-plant at Singur in Hooghly district, the mass protest by the common people, brutality by the police and the dialectic of the intellectuals.
Keywords: Singur Movement, Development, Industrialisation, Land Acquisition, Mass-Protest.

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন?— এ জমি লইব কিনে।"[1]

কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষ। কৃষিকে অবলম্বন করেই অধিকাংশ ভারতবাসী তাঁদের বিপুল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করেন। উর্বর ফলনশীল 'জমি' তাঁদের অর্থনৈতিক স্থানঙ্কের প্রধান মানদণ্ড। মা লক্ষ্মী। বেঁচে থাকার রসদ। সোনার চেয়ে দামি। সেকারণেই, এই মা লক্ষ্মীর উর্বর ধানিদেহে উন্নয়ন কিংবা শিল্পায়নের রক্তাক্ত হস্তক্ষেপ সহজ-সরল মানুষেরা কোনভাবেই সহ্য করতে পারেন না। গর্জে ওঠেন। অতীত ভারতবর্ষের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে উর্বর ফলনশীল কৃষিজমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে তাঁরা বারংবার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। একত্রিত হয়ে সংগঠিত করেছেন এক-একটি বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের। এর মধ্যে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক জোর-পূর্বক তিন ফসলী উর্বর-জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকেন্দ্রিক অন্যতম বৃহত্তর আন্দোলন— সিঙ্গুর আন্দোলন।

সময়টা ১১ মে ২০০৬। উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে সপ্তমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বামফ্রন্টের বৃহত্তম শরিকদল সিপিআই(এম) বিপুল ভোটে জয়ী হয়। কাজেই নির্বাচনের পরে-পরেই আশু প্রয়োজন মনে করে রাজ্য-সরকার— 'কৃষি

আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' শ্লোগানের মূল উপজীব্য অর্থাৎ রাজ্য-শিল্পায়নের চিত্রটাকে উজ্জ্বল করার জন্য যেকোনও উপায়ে শিল্পপতিদের পছন্দ অনুযায়ী জমিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যোগান দেওয়া শাসকদলের কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।[২] প্রয়োজনের এই সূত্র ধরে রাজ্যের যোগাযোগ সমৃদ্ধ হুগলি জেলার সিঙ্গুরে প্রবেশ ঘটে— মোটরগাড়ি তৈরির জন্য টাটা-কোম্পানির। কিন্তু টাটা কর্তৃক শুধু গাড়ি কোম্পানি নির্মাণ তথা শিল্পায়ন নয়; এর পাশাপাশি বেশিরভাগ ফলনশীল অতি-উর্বর জমি অধিগ্রহণ করে বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্যসরকার নিজের মুনাফা কায়েমের জন্য প্রোমোটার-রাজের হাতে তুলে দেয়। যেখানে প্রায় পাঁচ-ছশো একর জমি জুড়ে গড়ে উঠবে বিলাস-বহুল আবাসন, বিনোদন-কেন্দ্র এইসব। আসলে অঘোষিত SEZ[৩] অর্থাৎ স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে সুধাশ্যামলিম, উর্বর সিঙ্গুরকে। এবং স্বনির্ভর, স্বাধীন গ্রামের মেয়ে-বধূদের পরিণত করতে চায়— গার্হস্থ্য শ্রমিকে।

স্বল্পফলনশীল কিংবা অকৃষিজ পতিত-জমিতে শিল্পের সপক্ষে কৃষকদের সম্মতি থাকলেও, সরকার ও কোম্পানির শ্যেনদৃষ্টি উন্নত যোগাযোগক্ষম সিঙ্গুরের উর্বর ভূ-বলয়ে। ফলস্বরূপ, 'রক্ত দেব, প্রাণ দেব, জমি দেব না'[৪] শ্লোগানকে সামনে রেখে কৃষকরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠেন। ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে রাজনৈতিক লড়াইয়ে হেরে গিয়ে রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় তৎকালীন শাসকদল। 'সংস্কৃতিবান' সরকারের পুলিশ- র্যাফ-ক্যাডার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হন— নিরীহ কৃষক-সমাজ। বাদ যাননি— শিশু ও বৃদ্ধরা। নানাভাবে অসভ্যতা করা হয় মাতৃসমা নারীদের ওপর। পরবর্তীতে (ডিসেম্বর ২০০৭) শাসকদলের ক্যাডার ও পুলিশি বর্বরতার রোষানলে কৃষি-মজুর পরিবারের যুবক— রাজকুমার ভুল খুন ও চাষীপরিবারের অষ্টাদশী অগ্নিকন্যা— তাপসী মালিক ধর্ষিত ও শহিদ হলে; এই ঘটনার সূত্রধরে সরকারি রক্তচক্ষুকে পাত্তা না দিয়ে সংঘটিত হয় উত্তাল-গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ—

> রাজকুমারের পর দ্বিতীয় শহীদ তাপসী মালিক। মেহনতি দুটি পরিবারের ওপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এদের মৃত্যুকে হত্যা নয়, আত্মহত্যা বলতে হবে। কিন্তু কোন পরিবারই সরকারি রক্তচক্ষুকে পাত্তা দিচ্ছে না। স্থানীয় মানুষও এঁদের পাশে আছে। এবং ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও ১৮ ডিসেম্বর তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল করেন। মিছিলে শ্লোগান ওঠে: তাপসী মালিকের হত্যাকারী রাত পাহারাদার ও পুলিশকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও ফাঁসি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, রাত পাহারা বন্ধ করতে হবে। পোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুলও।[৫]

এরূপ দীর্ঘ প্রতিবাদের ফলস্বরূপ ২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ কাজে স্থগিতাদেশ এবং পরের মাসের ৩ অক্টোবরে সিঙ্গুর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে টাটা-কোম্পানি। কারণ, কোম্পানি ও সরকারের স্বৈরাচারী মন উপলব্ধি করেছিল ভূমিহারা মানুষের ক্ষোভের বারুদস্তূপে যেকোন মুহূর্তেই আরও বৃহত্তর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার পাশাপাশি লেখকেরা সমকালীন দেশ-কালকে তাঁদের লেখায় তুলে ধরেন। সাহিত্যের অন্যতম নবীন শাখা— ছোটোগল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের গুরুত্বপূর্ণ জমি-অধিগ্রহণ কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রচ্ছায়া তাই অবলীলাক্রমে উঠে এসেছে একাধিক বাংলা ছোটোগল্পের[৬] পাতায়। এরমধ্যে একটি অন্যতম ছোটোগল্প সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট

লেখক অনিতা অগ্নিহোত্রীর— 'বহিরাগত'। শিল্পায়নের নামে হুগলির সিঙ্গুরে টাটা-গোষ্ঠীর গাড়ি তৈরির কারখানা সম্পর্কিত উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ, সাধারণ মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বন্ধের উদ্দেশ্যে রাজ্য-সরকারের পুলিশি-হার্মাদের বর্বরতা, আন্দোলনকে অবলম্বন করে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালি-বুদ্ধিজীবী মনের টেনশন তথা দ্বান্দ্বিক-চিত্র, আত্মবিক্রিত গণমাধ্যমের ক্লেদাত্মক প্রতিচ্ছবি এবং বহিরাগত শব্দের অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ মানব-দরদী লেখক অনিতার নির্মেদ-গদ্যে নিষ্ঠুর সময়-প্রতিবেদক গল্পটিতে কীভাবে রূপলাভ করেছে তার মূল্যায়নই আমাদের এই নিবন্ধের অন্বিষ্ট।

'বহিরাগত' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে দৈনিক বর্তমান পত্রিকার রবিবার ক্রোড়পত্রে।[৭] গল্পের প্রথমেই পাঠক পরিচিত হন— পূষণ নামক একজন বামপন্থী আবেগের উত্তাপে উজ্জীবিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সত্তার দ্বান্দ্বিক পরিসরের সঙ্গে। যে দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ একটি প্রতিবাদের মুখ— সিঙ্গুর আন্দোলন। পরক্ষণেই লেখক খুব সচেতন ভাবে পূষণের হাতে খবরের কাগজ ধরিয়ে আখ্যানে উপস্থাপন করেছেন শিল্পায়নের পথে আরও এককদম এগিয়ে যাওয়ার জন্য শাসকদলের বলপূর্বক জমি-অধিগ্রহণ তথা দখলের নিষ্ঠুর কথাচিত্র—

> সকালে উঠে চায়ের সঙ্গে পাতা জোড়া রঙিন ছবি পেয়েছে।... জমিতে নিখুঁত শৃঙ্খলার সঙ্গে বড় বড় খুঁটি পুঁতছে গাদা গাদা লোক। এরা পুলিশও নয়, জমির মালিক নয়, আবার শিল্পপতিদের ভৃত্যস্থানীয়ও না। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, শাল কী আমের লম্বা লম্বা খুঁটি। এত গাছ কাটা পড়েছে কি রাতারাতি ? নীচে লেখা, 'শিল্পায়নের পথে আরও এক কদম।'[৮]

কিন্তু জমিহারা সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কোম্পানির কাজে তৎপর নাম-পরিচয়হীন মনুষ্যরূপ যন্ত্রগুলির কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করলে তাঁদের ওপর নেমে এসেছে রাজ্য-সরকার প্ররোচিত সশস্ত্র-পুলিশবাহিনীর নির্মম সন্ত্রাসলীলার রক্তাক্ত ছাপ— 'হ্যাঁ খুব পেটাচ্ছেই বটে, ছাদের উপর পেড়ে ফেলে, ঘরে ঢুকে মেয়েদের রেয়াত করছে না, জাস্ট মারছে, হাততালি দেবার মতনই নিঃশব্দ নিখুঁত অপারেশন... জনসংখ্যা ছাপিয়ে গেছে সংখ্যাতীত সশস্ত্র পুলিশ। আর দেব না, আর দেব না ধান, মোদের প্রাণ গো— এর জায়গায় টাটাদের জন্য খুঁটি পোতা... তবু এটা বাংলাই।'[৯] জমি দখলের জন্য কোম্পানির তোষামোদকারী বামসরকার নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় পৌঁছতে প্রস্তুত, তার নির্লজ্জ ছবি এখানে লেখকের প্রতিবাদী কলমে প্রস্ফুটিত। কারণ, প্রতিবাদী অনিতার কলম ইস্পাতের ফলার মতো অত্যাচারিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। সরকারি রণনীতির দাপট প্রশাসক লেখক ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন। নারী আমাদের মা। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকারের ধ্বজাধারী আত্মবিকৃত সিআইডি ও পুলিশীয়-চেতনায় তা নেই বলেই— 'হেলমেট পড়া র‍্যাফ দিনমজুরের রোগা বউকে পেটাচ্ছে।'[১০] এবং টিভি স্ক্রিনে সেই নিষ্ঠুরছবি দাউদাউ করে জ্বলছে। মানবতার প্রতি তীব্র অপমানের তাপ লেখক সহ্য করতে পারেননি বলেই তজ্জনিত ক্রোধ, অসহায়তা, তিক্ততা গল্পটির শিরা-উপশিরায় বইছে। শুধু তাই নয়, গল্পের পাশাপাশি এই জমি-অধিগ্রহণ প্রথার বিরোধিতা করে উক্ত-সরকার প্রদত্ত 'সোমেন চন্দ পুরস্কার' প্রত্যাহার করেছেন। কারণ, তিনি চেষ্টা করে চলেন জীবন ও লেখাকে একটা জায়গায় মেলাতে যাতে তাঁকে কখনও নিজের কাছে জবাবদিহি করতে না হয়—

> বলতে দ্বিধা নেই যে, মতাদর্শের হিসেবে আমি বামপন্থী। আজও তাই আছি। কিন্তু বামপন্থা যখন সরকার পরিচালনা করে, তার মধ্যে যখন মানুষের কথা না শোনার বা অগ্রাহ্য করার পর্ব এসে যায়, সেটার সমালোচনা করাও আমার কাজ বলে মনে হয়েছে। 'বহিরাগত'র মতো

> গল্প লেখা, বেশ কিছু কবিতা এবং সর্বোপরি 'সোমেন চন্দ পুরস্কার' যা বাংলা আকাদেমি আমাকে দিয়েছিলেন ২০০০ সালে, তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া, তা অনেকেরই ভালো লাগেনি সেই সময়। বিশেষ করে বামপন্থীদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু ও পরিচিত ছিলেন তাঁদেরও ঠিক মনে হয়নি... তবে আমার পক্ষে ওই সময় অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। কারণ আমি মতাদর্শ ও হৃদয়ের বৃত্তি, মানুষের প্রতি আমার যে কমিটমেন্ট, সেই সবকিছু দিয়ে চালিত হয়ে লেখালেখি করি।[১১]

নারী কেবল সুন্দরের পূজারি নন। প্রতিবাদের অগ্নিশিখাও তাঁদের মধ্যে বর্তমান। তাই অত্যাচার ও অসভ্যতার শিকারলীলার প্রতিস্পর্ধীরূপে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন আপন প্রতিবাদের ভাষায়। সিঙ্গুরের বাস্তব-অগ্নিকন্যা অষ্টাদশী তাপসী মালিকের মতো এই আখ্যানের অন্যতম নারী চরিত্র সাহিত্যিক ও গৃহবধূ অরূপাও সরকারের চোখরাঙানি, গ্রামের রাস্তায় পুলিশি-টহল ও কাঁদানো গ্যাসকে উপেক্ষা করে বহিরাগত হয়েও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছেন। প্রতিপক্ষ 'নকশাল' তকমা দিয়ে তাঁকে বন্দী করলেও, তাঁর প্রতিবাদের স্থানঙ্ক-পারদ এক চিলতেও কমেনি। লেখক অনিতার অন্তঃস্থিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রতিবাদী মন অরূপার মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ-গদ্যে রূপায়িত। নারীর এরূপ প্রতিরোধীসত্তা সত্যিই আন্দোলনকারীদের দিশা দেখায়। গল্পের অন্যতম দুই-চরিত্র পূষণ ও অনিমেষের কথোপকথনে অরূপার সেই বীরাঙ্গনা মনের পরিচয় মেলে— "'কাল এলি না! তীর্থরা এসেছিল। তোর জন্য অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম আমরা। কথায় কথায় ফোন করতে খেয়াল হয়নি।'/ 'অরূপা?'/ 'মেয়েটা গেছে ওখানে। এত ইমোশনাল আর জেদি।'"[১২]

বিশ্বায়ন, ভোগবাদ ও সরকারি শাসন-ব্যবস্থায় চরম ব্যর্থতা রাজ্যে এনে দেয় বেকারত্বের ঢেউ। শিল্পকে বেকারত্ব দূরীকরণের মহৌষধ মনে করে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী, সিপিআই(এম)-এর ঔদ্ধত্যের সমর্থক আলোচ্য গল্পের— অনিমেষ। কারণ, বেকারত্বের জ্বালা তার মজ্জার ভিতর। শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের ব্যাকুল চেষ্টার পক্ষ নিয়ে তাই সে অদৃশ্য প্রতিপক্ষের তীব্র সমালোচনা করে— 'এরা পশ্চিমবঙ্গে কিছু হতে দেবে না বুঝলি। এই যে সস্তায় গাড়ি— এই নিয়ে দুই গাড়ি কোম্পানির লড়াই। বাইরের লোকজন গিয়ে ঢুকেছে ফায়দা তুলতে। আমরা তাহলে কোনোদিন শিল্প গড়ব না, অ্যাঁ! এরা যদি ভয় পেয়ে পালায়! আর কেউ কিন্তু কোনোদিন আসবে না পশ্চিমবঙ্গে।'[১৩] কিন্তু উর্বর জমির উপর সরকারের চরম অযৌক্তিক অমানবিক কার্যক্রম তথা শিল্পায়নের বিরোধিতার পক্ষে নাগরিক বুদ্ধিজীবী পূষণের অবচেতন মন। তাই অন্যমনস্কভাবে সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে ভাবতে সে বিনা দ্বিধায় সমালোচনা করতে চায় পুলিশি-বর্বরতার। শুধু তাই নয়, অনির্দিষ্ট কারও প্রতি সওয়াল করে ওঠে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে—

> জমি কোথায় যায়?... বেড়াবেড়ি, গোপালনগর, খাসেরভেড়ি, বাজেমেলিয়া— সাড়ে তিন হাজার একরের মতো জমি যাচ্ছে শিল্পে। পঁচিশ হাজার মানুষ। সেচ ব্যবস্থা। ৩৭টা মিনি টিউবওয়েল। আলু পাট উচ্ছে বেগুন কুমড়ো পটল— এছাড়া ধান। লাখ লাখ টাকার সবজি বিকোয় এ জমি থেকে। চাষের সঙ্গে চাষী ছাড়াও জড়িয়ে আছে দিনমজুর, ভেন্ডার সার ব্যবসায়ী, বীজের দোকানদার, বাজারের পাইকারি ও খুচরো দোকানদার... তাদের কী হবে?[১৪]

এককালীন ক্ষতিপূরণের টাকা দারিদ্র্যের আলো-আঁধারী মায়াজালে তাঁদের কাছ থেকে ধোঁয়া হয়ে আকাশে উবে যাবে। তাই উর্বর জমিতে শিল্প নয়, বরং ফলনশীল শ্যামল-ভূমি চাষী, বর্গাদার, দিনমজুর, ব্যবসায়ীকে বাঁচিয়ে রাখবে। চাষীদের বাড়ির কড়িকাঠে দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেবে না। ভারতের শত শত গ্রাম ও জঙ্গল ঘেরা আদিবাসীদের মতো পেটে ক্ষুধা নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন না। শিল্পায়নের জন্য যে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন, তা চাষীদের মাথায় নেই। ফলস্বরূপ উন্নয়নের ভাগ তাঁদের পকেটে যাবে না; বরং যাবে প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, শিক্ষিত বাইরের মানুষের হাতে। নিজভূমে পরবাসী হতে হবে বলেই তাঁরা শিল্পায়ন নামক আপাত জনবিরোধী-শক্তির বিরুদ্ধে একত্রিত হন। সুমিত সরকার, রোমিলা থাপার প্রমুখ সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব সহ বাংলার প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর মতো এই গল্পের পূষণের অবচেতন মনও উর্বর জমিতে শিল্পয়ায়ন বিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে, মনে মনে ভেবেছে— ‘তার মত… জানতে চাইলে পূষণ বিনা দ্বিধায় নিন্দে করত পুলিশি বর্বরতায়।’[১৫] কিন্তু হঠাৎ টিভি স্ক্রিনে ভেসে ওঠা পুলিশি অত্যাচারের সন্ত্রাস-চিত্র দেখে সরকারি চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী পূষণ সচেতন হয়ে ওঠে; এবং বিবৃতিতে আর প্রতিবাদী রূপের ছোঁয়া মেলে না। বরং নিরপেক্ষ বা প্রগতিশীলতার মুখোশ খসে পড়ে প্রকাশিত হয় আত্মকেন্দ্রিক, সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের ভয়ার্তরূপ। যেরূপ নিরন্তর অন্বেষণ করে চলে গা-বাঁচিয়ে চলার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের। আসলে গল্পকার অনিতা অগ্নিহোত্রী খুব সচেতন ভাবে আপসহীন নিজস্ব স্টাইলে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর চেতনার দ্বান্দ্বিকরূপ তথা সংকটকে বিশ্লেষণ করেছেন পূষণ চরিত্রের প্রতীকে। গল্পের বীরনারী অরূপার প্রতিরোধী মনের বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বোল্লিখিত প্রতিকায়িত চরিত্রের রূপকে বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মিক-সংকটের চিত্রটি ব্যঞ্জিত— ‘অরূপার এই নতুন মুখ দেখে গর্ব হয়। আবার আফশোসও হয় পূষণের। ইস, আজ সে যদি যেত ওখানে, অরূপার বদলে। কথাটা এত অলীক তার মতো সরকারি কর্মচারীর জন্য, যে নিজের কাছেও বলার মত নয়।’[১৬]

সিঙ্গুর অতি উর্বর, বহু ফসলি, সেচ-সেবিত কৃষি-অঞ্চল। জমির সঙ্গে কৃষকদের প্রাণের বন্ধন খুবই নিবিড়। ফলে এই জমি টাটা-কোম্পানির হাতে তুলে দিতে কৃষি-নির্ভর মানুষের এত আপত্তি। এই ‘আপত্তির’ অগ্নিশিখাকে আরও প্রবল আকারে জোরদার করে তুলেছেন সিঙ্গুর নামক ভূখণ্ডের বাইরের সমাজ ও পরিবেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ‘নন পলিটিক্যাল’ বেশ কিছু মানুষজন। শাসকদলের কাছে যাঁরা— বহিরাগত। যাঁদের সচেতনভাবে সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত করে জমি অধিগ্রহণের পথকে সুগম করে তোলার জন্য ফ্যাসিস্ট বামসরকার বেছে নিয়েছেন নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের। পুলিশ ও পুলিশের পোশাক পরা শাসকদলের কুখ্যাত ক্যাডার-বাহিনীর মিলিত রক্তচক্ষু, কাঁদানো গ্যাস এবং গোটা সিঙ্গুর অঞ্চলকে বাইরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ১৪৪ ধারা জারি তার মধ্যে অন্যতম। নয়তো, তাঁদের মুক্ত-চেতনার প্রতিবাদী রঙে গ্রামগুলি আরও রঙিন ও উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ, শাসকবাহিনী জোরালো প্রতিবাদের প্রতীক নর্মদা-আন্দোলনের নেত্রী পরিবেশকর্মী মেধা পাটেকরকে সিঙ্গুরের যূথবদ্ধ আন্দোলন-কর্মীদের পাশে দ্বিতীয়বার দাঁড়াতে দেয়নি। বরং ১০ জানুয়ারি ২০০৮ সিঙ্গুরে যাওয়ার পথে কলকাতার বাইপাস অঞ্চল থেকে তাঁকে ‘শান্তিবিঘ্নকারী বিপজ্জনক বহিরাগত ব্যক্তি’ হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ গ্রেফতার করে। কারণ— মেধার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে ভয় পেয়েছেন সমকালীন তাণ্ডব প্রক্রিয়াকামী প্রশাসন। সমকালীন সময়-প্রতিবেদক এই ঘটনাগুলিকে Fictional Sketch-এ অনিতা তাঁর ‘বহিরাগত’ গল্পটিতে যুক্তিসহকারে নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আখ্যানের অন্যতম দুই-চরিত্র পূষণ ও অনিমেষের উচ্ছেদ-বিষয়ক

তর্কবিতর্কের মধ্যে হঠাৎই সিপিআই(এম) মতাদর্শের সমর্থক অনিমেষের জবানিতে বহিরাগতদের প্রতি তীব্র-ক্ষোভের পরিচয় মেলে— 'এই যে তোদের মেধা, মেধা পাটেকর বা পাটকর— ওর লজ্জা করে না— বোরখা পরে চোরের মত ঢুকছিস— কাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিস— তাদের জাতগোত্র জানিস?... নন পলিটিক্যাল! ওসব অনেক দেখেছি। কার সঙ্গে কার আঁতাত।'[১৭] বহিরাগত নামক সমাজ ও পরিবেশ কর্মীদের প্রতি বামপন্থীদের ক্লেদাত্মক মনোবৃত্তি গল্পকার অনিমেষের মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, আন্দোলন থেকে দূরীভূত করার জন্য পুলিশের নৃশংস রক্তলোলুপ লাঠির কালশিটে ছাপ তাঁদের শরীরকে স্পর্শ করে গেছে—

> মাত্র একজন গ্রামবাসী কাল লাঠির আঘাতে আহত হয়েছেন। বাকিরা সকলেই ছিল বহিরাগত। তাদের চিহ্নিতও করা হয়েছে। মাত্র একজনই গ্রামবাসী। তার নামও আছে কাগজে। বিরোধী দলের সদস্য... যারা পুলিশের মার খেয়েছে তারা সকলেই বহিরাগত—[১৮]

আলোচিত গল্পের বহিরাগত প্রতিবাদী-নারী অরূপাকেও অমানুষিক অত্যাচার সহ্যের পাশাপাশি 'নকশাল' তকমায় ভূষিত হয়ে বন্দী হতে হয়েছে। কিন্তু এই নারী রণে ভঙ্গ দেননি। অরূপার মায়ের 'তবু সে আসবে না। ওই দিনে, মাঠে বসে থাকবে গ্রাম সীমানার যত কাছে থাকা যায়।'[১৯]— সংলাপে তা প্রতিফলিত। অরূপা আসলে আমাদের অচিন রায়ের 'ধরিত্রী' গল্পের ধরিত্রী চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। আসলে, তৎকালীন সরকার সিঙ্গুরে যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তাঁরা বহিরাগত এরূপ দোষারোপের পদ্ধতি অবলম্বন করে জমি অধিগ্রহণ-কেন্দ্রিক আলোচনার ওপর একটি পর্দা টেনে দিতে চাইলেও তা চরিতার্থ হয়নি। বরং বহিরাগত শব্দটি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, হয়ে উঠেছে যূথবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদী চৈতন্য। যে চৈতন্য পরবর্তীকালে নন্দীগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে খুব কম সময়ের মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত ও ত্বরান্বিত করে তুলেছে।

বর্তমান সমাজে গণমাধ্যমের বিশেষত সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদপত্র সারাবিশ্বের প্রকৃত ছবিকে শব্দের শরীরে এঁকে নিরপেক্ষভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। এবং ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি। কিন্তু নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে অনেক সময় গণমাধ্যম নিজেদের সততাকে ভূলুণ্ঠিত করে তোলে, যা সমাজের হিতসাধনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। এই গল্পেও স্বার্থলোভী কিছু সংবাদপত্রের ক্লেদাত্মক ছবি গল্পকার নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সিঙ্গুরের জমি-অধিগ্রহণের জন্য সরকার কর্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সত্যচিত্রকে শাসকের পদলেহনকারী বেশ কিছু সংবাদপত্র তেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেনি; আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগঠিত নারকীয় অত্যাচারলীলাকে বেমালুম চেপে গেছে। সেকারণে, পূষণ টিভিতে পুলিশের অদৃশ্য প্রতিপক্ষের দিকে কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ কিংবা অত্যাচারের জলন্তছবি দেখেছিল, পরের দিন সংবাদপত্রের কয়েকটি স্টিলছবি ও নিজস্ব-সংবাদদাতার বয়ানে উত্তপ্ত সেই ঘটনার তাপ-প্রবাহ নেই। শান্ত, পরিশীলিত ও শত ধৌত বর্ণনার পরতে পরতে রয়েছে বর্বর-পুলিশের কার্যক্রমের সমর্থনের নানাবিধ ইশতেহার। গল্প-কথকের মুখে তাই শুনি—

> খুবই আশ্চর্য, কাগজে যা এসেছে সবই খুব শব্দহীন, পরিশীলিত আর শত ধৌত অবস্থায়। ইরাক যুদ্ধের সময় এইরকম নিঃশব্দ যুদ্ধ-সংবাদ পরিবেশনা নিয়ে তারা কত আলোচনা করেছিল। বিদেশি সংবাদমাধ্যমের সেই নিপুণ গলা পাড়ার কাগজও শিখে গেল তাহলে।[২০]

এরূপ বয়ান আসলে শাসকদলের তোষামোদকারী সংবাদপত্রের মাধ্যমে ছদ্মবেশী নিষ্ঠুর পুলিশি সন্ত্রাসের নারকীয় অত্যাচারের রক্তাক্ত হাতকে স্যানিটাইজেশনের প্রয়াস মাত্র। পাঠক তা অনুভব করতে পারেন। আসলে, মানবদরদী অনিতা অগ্নিহোত্রী 'বহিরাগত' গল্পটিতে সিঙ্গুর নামক বিশেষ অঞ্চলের হিমশীতল, ক্ষয়িষ্ণু সময়চিত্রকে তুলে এনে বর্তমান-পাঠককে সেই সময়ের রক্তাক্ত দিনগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্যের কিংবা বৃহত্তর অর্থে দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে শিল্পের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তবে শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে উর্বর কৃষিজমিকে ধ্বংস করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করার কৌশল আসলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি-নির্ভরশীল বিশাল সংখ্যক মানুষদের পুনর্বাসন না দিয়ে স্বল্প কিছু ক্ষতিপূরণের প্রলোভন দেখিয়ে জীবন, জীবিকা ও শ্যামল-পরিবেশ থেকে উচ্ছেদ করা কখনোই বিকল্প পথ নয়। সেকারণেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচির অন্যতম পদক্ষেপ— টাটা-কোম্পানির গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন সফল হয়নি। বরং সিঙ্গুরের ভূমি-অধিগ্রহণ কেন্দ্রিক কদর্য বর্বরতার প্রচ্ছায়া সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে এবং সিঙ্গুর হয়ে ওঠে প্রতিবাদের আরেক নাম। অনিতা অগ্নিহোত্রী 'বহিরাগত' গল্পটির মধ্য দিয়ে 'সাহিত্যিক-রেখাচিত্রে' সেই জমি অধিগ্রহণ-কেন্দ্রিক আন্দোলনকে অণুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এবং পাঠকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

1) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪২৪, পৃ. ৭৬।
2) রূপা আইচ (সম্পাদিত), সিঙ্গুর আন্দোলন : আমাদের ভাবনা আমাদের প্রতিবাদ, ইম্যানসিপেশন, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৭, পৃ. ৩০।
3) দীপংকর চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ : সেজ (জাতীয় জমি-গ্রাস প্রকল্প), অনীক, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ: ৭ নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ভূমিকা অংশ।
4) রূপা আইচ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত সিঙ্গুর আন্দোলন: আমাদের ভাবনা আমাদের প্রতিবাদ, পৃ. ১০৬।
5) তদেব, পৃ. ১০৮।
6) কার্তিককুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), সময়ের গল্প : সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, সংবেদন, মালদা-০১, প্রথম প্রকাশ: ২৩ জুলাই ২০১৭।
7) নিত্যরঞ্জন দেবনাথ (সম্পাদিত), শতানীক, হুগলি-০২, শারদীয় সংখ্যা : ১৪২৯, পৃ. ১৭২।
8) অনিতা অগ্নিহোত্রী, দশটি গল্প, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১৮।
9) তদেব, পৃ. ১৯।
10) তদেব, পৃ. ২০।
11) নিত্যরঞ্জন দেবনাথ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত শতানীক, পৃ. ১৭৩-৭৪।
12) অনিতা অগ্নিহোত্রী, পূর্বোক্ত দশটি গল্প, পৃ. ২২।
13) তদেব।
14) তদেব, পৃ. ২৩।
15) তদেব, পৃ. ২১।
16) তদেব, পৃ. ২৪।
17) তদেব, পৃ. ২৩।
18) তদেব, পৃ. ২৪।
19) তদেব, পৃ. ২৪।
20) তদেব, পৃ. ২১।